আনন্দবাজার পত্রিকা

ছেলের দৃষ্টি আবছা, মায়ের চোখ আগলায় অন্যদের

সোমা মুখোপাধ্যায়

দুটো চোখ ফেটে বেরিয়ে এসেছে। মণি সমেত সমস্তটা ঝুলছে নাকের পাশে। গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। একরত্তি বাচ্চাটা কথা বলতে পারছে না। এমনকি, শরীরটা নাড়াতেও পারছে না। সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার বলছেন, চোখের ক্যানসার। বলছেন, ‘অনেকটা দেরি করে ফেলেছেন তো! আর কিছু করার নেই।’ আকুল হয়ে বাচ্চার মা দৌড়চ্ছেন এক হাসপাতাল থেকে আর এক হাসপাতালে। সাহায্যের আশায়।

১৩ বছর পর আর একটা পুজো। কেমোথেরাপি, অস্ত্রোপচারের দীর্ঘ পথ পেরিয়ে ছেলেটা প্রাণে বেঁচেছে। কিন্তু তার একটা চোখ এখন সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন। অন্য চোখে পাওয়ার এত বেশি যে একটানা যে কোনও কাজেই অসুবিধা হয়। ছেলেটার মা এখনও আকুল হয়ে ঘোরেন সরকারি হাসপাতালে। তবে নিজের সন্তানের জন্য নয়, ক্যানসার আক্রান্ত অন্য শিশুদের দিশা দেখানোর জন্য।

ছেলেটাকে নিজের সব কাজ একা হাতে করতে হয়। নড়বড়ে দৃষ্টি নিয়ে একা একাই রাস্তায় নেমে স্কুলে যেতে হয়, অন্য শিক্ষকের কাছে পড়তে যেতে হয়। প্রতি পদে বিপদের ঝুঁকি। খেলায় খুব আগ্রহ তার। ক্রিকেট, ফুটবল, সাঁতার। কিন্তু সব জায়গা থেকেই তাকে একটাই জবাব পেতে হয়, ‘না’! তাকে দলে নেওয়া যাবে না।

এর পর পৃঃ ৫ ▶

■ মুদিয়ালির বাড়িতে মা ও ছেলে। ছবি: *বিশ্বনাথ বণিক*

আনন্দবাজার পত্রিকা

ছেলের দৃষ্টি

▶ পৃঃ ১-এর পর

চোখে দেখে না যে!

আজ, শনিবার মহালয়া। দেবীর চক্ষুদানের দিন। সেই একরত্তি বয়স থেকেই ছেলেটা শুনেছে সে কথা। আর মাকে বলেছে, "আচ্ছা, আমার চোখ আবার ঠিক হতে পারে না কখনও? আবার কখনও বন্ধুদের মতো সব দেখতে পেতে পারি না আমি?"

মুদিয়ালিতে সরু গলিতে আক্ষরিক অর্থেই এক চিলতে ঘর। ঘরে পা ফেলতেই গুচ্ছের জিনিসপত্র ঠাসা অনেকখানি উঁচু চৌকি, তার নীচেই যাবতীয় গেরস্থালি। মা আর দাদু-দিদার কাছে থাকে ছেলেটা। বাবা ছেড়ে চলে গেছে। মা বললেন, "আমার ওপর খুব অত্যাচার করত। সব হজম করতাম। যে দিন থেকে এই ছেলেটার ওপর অত্যাচার শুরু করল, বেরিয়ে আসার আগে এক মুহূর্ত ভাবিনি।"

করবী সাউ আর দেব সাউ। চোখের ক্যানসার—'রেটিনো ব্লাস্টোমা'-র শিকার দেব-এর স্বাভাবিক শৈশবটা তিল তিল করে শেষ হতে দেখেছেন করবী। একটাই আশ্বাস, ঠাকুরপুকুর ক্যানসার হাসপাতালে চিকিৎসক সোমা দে-র চিকিৎসায় ছেলেটা প্রাণে বেঁচেছে।

সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে ৩২-এর এই তরুণীর এখন জীবনের ব্রত ক্যানসার আক্রান্ত শিশু ও তাদের পরিবারের লোকজনকে দিশা দেখানো। একটি বহুজাতিক সংস্থার সহযোগিতায়, একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে এসএসকেএম এবং এনআরএস মেডিক্যাল কলেজে শিশুদের ক্যানসার বিভাগে গরিব রোগীদের দিশা দেখানোর প্রকল্পের কোঅর্ডিনেটর করবী। বলছিলেন, "কেউ দিশা দেখানোর না থাকলে কী হয় আমি জানি। অনেক বাচ্চা ছিটকে যায় চিকিৎসা থেকে। ওষুধ-পরীক্ষানিরীক্ষার খরচ জোটাতে না পেরে আর হাসপাতালে আসে না তারা। কোথায় গেলে কী সুবিধা পাওয়া যায়, কী ভাবে তার জন্য আবেদন করতে হয়, কেন ক্যানসারের চিকিৎসায় নিয়মিত ফলোআপ জরুরি, সেগুলো আমি নিজের জীবন দিয়ে বুঝেছি। মানুষকে সেটাই বোঝাতে চাই। সেই কাজটাই করি।"

এই কাজ থেকে যে সামান্য উপার্জনটুকু হয়, তা দিয়েই নিজের আর ছেলের খরচ জোটানোর চেষ্টা করেন। প্রকল্পের কান্ডারি পার্থ সরকার বলছিলেন, "মেয়েটার মনের জোর দেখে অবাক হতে হয়। মানুষ নিজের সুস্থ সন্তানকেও রাস্তায় একা ছাড়তে ভয় পায়। আর ও অসুস্থ ছেলেকেও বাধ্য হয়ে একা ছাড়ে। নিজের ছেলেকে দেখাশোনা করতে পারে না। অথচ অসংখ্য ক্যানসার আক্রান্ত বাচ্চাকে সারা দিন বুকে জড়িয়ে রাখার চেষ্টা করে।" করবী বলেন, "যে দিন হাসপাতালে গিয়ে দেখি কোনও বাচ্চার অবস্থা খুব খারাপ, অসম্ভব কষ্ট হয়। আলাদা একটা ঘরে গিয়ে লুকিয়ে কাঁদি। নিজের আর নিজের সন্তানের ওই সময়টার কথা মনে পড়ে।"

শরীর খারাপের জন্য মাঝেমাঝেই স্কুল কামাই হয়। সে নিয়ে সমস্যাও হয়। পড়তে বিশেষ ভাল লাগে না দেব-এর। ছবি আঁকতে খুব উৎসাহ। পার্থরা আঁকার স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছেন। মন ঢেলে আঁকে ছেলেটা।

করবী বললেন, "খুব রাগ হয় ওর। সব জায়গা থেকে 'না' শোনে তো! এই যে প্রতি বছর অপেক্ষা করে থাকে পুজোর সময় ঠাকুর দেখতে বেরোবে, সেখানেও অনেক বিধিনিষেধ। ভিড়ের জায়গায় যাওয়া চলবে না তো ওর। সব রাগ, কষ্ট, হতাশা ও আঁকায় উজাড় করে দেয়।"

আপাতত দুর্গা ঠাকুরের ছবি আঁকছে দেব। চোখে তুলি বোলাতে বোলাতে জিজ্ঞাসা করছে, "আমার চোখ কখনও ঠিক হবে মা?"